নিরাপত্তা

কখন, কোথায়, কেন ও কিভাবে?

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

নিরাপত্তা: কখন, কোথায়, কেন ও কিভাবে?

-উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও পরিবেশনা

সূচিপত্র

(পূর্বকথা)..৪

কুরআনের আলোকে নিরাপত্তা ৬

হাদীস ও সীরাতের আলোকে নিরাপত্তা... ৮

নিরাপত্তা বনাম তাওয়াক্কুল: সংঘাত না সমন্বয়..১২

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা...১৪

নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু নির্দেশনা...১৮

নিরাপত্তা সম্পর্কিত কয়েকটি নীতিমালা। ২১

নিরাপত্তা ও সতর্কতা... ২৩

নিরাপত্তা ও মনোকষ্ট...২৪

নিরাপত্তা কি শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য?... ২৬

নিরাপত্তা অবলম্বনকারীদের জন্য কয়েকটি নীতিমালা ২৯

১. নিজেকে বাঁচানো ও নিরাপত্তা ২৯

২. কাউকে অবজ্ঞা করা ও নিরাপত্তা...৩৪

৩. মিথ্যা বলা ও নিরাপত্তা ৩৫

সর্বশেষ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪১

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم،

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ، يَفْقَهُوا قَوْلِي.

(পূর্বকথা)

আজ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, সে বিষয়টি আমাদের আমল এবং জিহাদের বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষকরে যে ময়দানে আমরা কাজ করছি; তার সূত্রে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাঝে উদাসীনতা ও সীমালঙ্ঘন উভয়টিই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কেউ কেউ বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না! উল্টো এ কথা বলে যে, ভাই! এতে সাথীদের মন নষ্ট হবে এবং বহু সাথী মন খারাপ করবে। অন্যদিকে অনেকে নিরাপত্তার নামে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে যে, যেখানে মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানেও স্পষ্ট মিথ্যা বলে দেয়। কখনো আবার এমন কথাও বলে, যার কারণে অনেকের হৃদয় পুঁড়ে দগ্ধ হয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট করণীয় কি? তা জানা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন বিষয়টিকে আমরা একেবারেই (গুরুত্বহীন) একটি সাধারণ বিষয় মনে না করি এবং এ নিয়ে যেন আমাদের জিহাদ ও পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। কারণ পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা একান্তই জরুরী ও তা তাকওয়া অর্জনের (অন্যতম) মাধ্যম। সূরা আনফালের এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ... ﴿الأنفال: ١﴾

“অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মাঝে বিদ্যমান পরস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন কর।”(সূরা আনফাল : ১)

হযরত মাওলানা শফী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে যে স্থানে বান্দাকে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সে স্থানে সেই নির্দেশের সাথে এমন কোন ইঙ্গিত বা ইশারাও দিয়ে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে বান্দা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর বক্তব্য আপনারা হয়তো পড়েছেন। তিনি বলেছেন, তাকওয়া একটি নূরানী অবস্থার নাম। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝে আসে যে, তাকওয়া অর্জনের (অন্যতম) মাধ্যম হলো: পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা। যদি আপনি পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাকওয়া অর্জনের তাওফীক দিবেন। এ কারণে আমাদের সবার জন্য আবশ্যক হলো: পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা। যেন আমরা সবাই তাকওয়া অর্জন করতে পারি।

(মূল আলোচনা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

কুরআনের আলোকে নিরাপত্তা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿النساء: ٧١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অত:পর পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে (জিহাদে) বেরিয়ে পড়।"(সূরা নিসা : ৭১)

আল্লাহ তা'আলা যে যে স্থানে মু'মিনদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অন্য যে কোন বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন, সে সে স্থানে তার নিয়ম-পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে দু'টি বিষয়ের প্রতি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন-

প্রথম বিষয় হলো- خُذُوا حِذْرَكُم অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন কর, নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

দ্বিতীয় বিষয় হলো- فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا অর্থাৎ অত:পর পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে (জিহাদে) বেরিয়ে পড়।

উলামায়ে কেরামের নিকট (ف) অব্যয়টি পরবর্তী বুঝানোর জন্য আসে। তাই আয়াতটির মর্মার্থ হবে- প্রথমে নিরাপত্তা নিশ্চিত কর, তারপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, যুদ্ধ কর। অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দাও, তারপর জিহাদ কর।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ... ﴿النساء: ١٠٢﴾

"তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।" (সূরা নিসা : ১০২)

এভাবে কুরআনুল কারীমের কয়েক স্থানে আসহাবে কাহাফ (গুহার অধিবাসীগণ), হযরত মূসা (আ:) ও হযরত ইউসুফ (আ:) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে আসহাবে কাহাফের ঘটনা অনেক আয়াতে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এসেছে। যা থেকে নিরাপত্তা অবলম্বনের গুরুত্ব বুঝে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আসহাবে কাহাফ যখন ঘুম থেকে উঠে, তখন তাদের এক সঙ্গীকে বলেছিলো, বাজার থেকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছু নিয়ে আস। লক্ষণীয় বিষয় হলো: তারা তাদের সে সঙ্গীকে কি বলেছিলো? তাদের সে সঙ্গীকে তারা যা বলেছিলো, তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। কারণ, আমাদের মনে করা উচিত যে, আমরাও তো এ যুগের আসহাবে কাহাফ। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন) আমরা যদি আমাদের কোন সঙ্গীকে (বর্তমানেও) বাজারে পাঠানোর সময় সে শব্দগুলোই বলি, তবে তা মোটেও ভুল হবে না। কারণ, তারা তাকে যা বলেছিলো, বর্তমানে তা (তাদের মত) আমাদেরও বলা প্রয়োজন। তাদের সে উক্তিটি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের সে সঙ্গীকে বলেছিলো-

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿الكهف: ١٩﴾

"সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়।" (সূরা কাহাফ : ১৯)

অর্থাৎ নম্রভাবে কথা বলবে, সতর্কতার সাথে কথা বলবে। এমন কোন কথা বলবে না, যা থেকে অন্যরা আমাদের মূল পরিচয় জেনে যেতে পারে।

আমরা কত জায়গায় যাই- শহরে যাই, এদিক-সেদিক যাই, তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তারা যেন আমাদের মূল সম্পর্কে জানতে না পারে। মূল মানে আমাদের কার্যক্রম। কারণ তারা যদি আমাদের মূল তথা কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে যায়, তাহলে আমাদের ক্ষতি করবে। আমাদের কি ক্ষতি করবে ? আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿الكهف: ٢٠﴾

“তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।”(সূরা কাহাফ : ২০)

অর্থাৎ ওরা যদি তোমাদের সম্পর্কে জেনে ফেলে يَرْجُمُوكُمْ তবে তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে। এর পরবর্তী অংশে আরও বলেন- أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ অথবা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবে ওদের ধর্মে। আল্লাহ না করুন! তখন তোমরা নিজেদের ধর্ম ছেড়ে দিবে।

আল্লাহ না করুন! আল্লাহ না করুন! একজন মুজাহিদ যখন গ্রেফতার হয়। তখন সে কত বড় মুসিবত এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়! আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন- তোমরা যদি তাদের ধর্মে ফিরে যাও وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا তাহলে তোমরা আর কিছুতেই সফলকাম হবে না।

তাই আমাদের সাথীদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটাই কথা- وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا নম্রভাবে কথা বলবে, সতর্কতার সাথে কথা বলবে। এমন কোন কথা বলবে না, যা থেকে অন্যরা আপনাদের মূল পরিচয় জেনে যেতে পারে।

কোন সাথী গ্রামে যেতে চাইলে তাকে বলবে وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا খানা দেয়ার সময় বলবে وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا প্রভৃতি।

হাদীস ও সীরাতের আলোকে নিরাপত্তা

আপনি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাতের দিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে তাতে দেখতে পাবেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা শুরু করেছেন এবং ইসলামের সূচনালগ্নে দাওয়াতের

কাজ আরম্ভ করেছেন, তখন সে কাজ গোপনে করেছেন না প্রকাশ্যে? নিশ্চয় গোপনে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...﴾ [التحريم: ٦]

"তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"(সূরা তাহরীম : ০৬)

আয়াত থেকে বুঝে যাচ্ছে- ইসলামের সূচনাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি কাজ ছিল গোপনে। এ দাওয়াতি কাজ এতটাই গোপনে ছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথক পৃথকভাবে এক একজনের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেছেন। এমনিভাবে ইসলামের সূচনাকালে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবাদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দারে আরকাম অর্থাৎ হযরত আরকাম রাযি. এর ঘরে সবার সাথে একত্রিত হতেন। সে সময় আরকাম রাযি. এর বয়স ছিলো (মাত্র) ১২ বছর। অন্য অনেক সাহাবীর ঘর থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এত স্বল্প বয়সী ছাহাবীর ঘর দারে আরকামকে নির্বাচন করলেন? এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষনীয় বিষয় হলো: আরকাম রাযি. এর ঘরটি আবু জাহালের ঘরের একেবারেই নিকটে ছিলো। তাঁর ঘরটি আবু জাহালের ঘরের একেবারেই নিকটে হওয়ায় আবু জাহাল এদিক-ওদিকের খোঁজ-খবর রাখলেও তার খবরই ছিল না যে, তার শত্রুরা তার ঘরের নিকটেই এসে একত্রিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবাদের সাথে সেখানে একত্রিত হতেন; সীরাতের কিতাবে এসেছে- তখন সেখানেও তিনি তাদের সাথে কানাঘুষা করে, চুপিসারে কথা বলতেন। যেন আওয়াজ দূরে না যায় এবং শত্রুরা বুঝতে না পারে।

হযরত রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত আনাস রাযি.। তিনি ছিলেন একদম ছোট একটি বাচ্চা। তথাপি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিভিন্ন কাজে পাঠাতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন এক কাজে

কোথাও পাঠিয়েছেন। ঘরে ফিরে আসার পর তার মা তাকে বলল, বাবা! এত দেরী করে ঘরে ফিরেছো কেন? তিনি বললেন, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা কাজে পাঠিয়ে ছিলেন। মা বলল, তিনি কোন কাজে তোমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তিনি বললেন, মা! আমি আপনাকে সে কাজটির কথা বলতে পারব না।

এ সম্পর্কিত আরও একটি ঘটনা- "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাযি. মক্কার মুশরিকগণ কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার হন। যার ফলে হযরত আবু বকর রাযি. বেহুশ হয়ে পড়েন। হুশ ফেরার পর তিনি তাঁর মাকে ডেকে বললেন, মা! আপনি গিয়ে হযরত উমর রাযি. এর বোনকে জিজ্ঞাসা করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? তাঁর মা গিয়ে হযরত উমর রাযি.এর বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. এর বোন বললেন, তাঁর সম্পর্কে আমি কি জানি? এভাবে বলার কারণ ছিল, হযরত উমর রাযি. এর বোন নিশ্চিত ছিলেন না যে, হযরত আবু বকর রাযি. এর মাকে বললে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কিনা। যখন হযরত আবু বকর রাযি. এর মা বলল, কথাটি আবু বকর-ই জিজ্ঞাসা করেছে। তখন হযরত উমর রাযি. এর বোন বলল, আচ্ছা! ঠিক আছে। তাহলে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। যখন সে তাকে হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট নিয়ে গেল, তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? উত্তরে চুপিসারে তিনি বললেন, আপনার মা আমার পিছন থেকে আমাদের কথা শুনছেন! হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, কোন অসুবিধা নেই। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে, এবার শুনুন।" এমনি ছিল তাদের নিরাপত্তা।

বাইয়াতে আকাবার ঘটনাটি সবার জানা থাকার কথা। যখন আনসারগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাদের সময় দিতেন এবং বলতেন, খেয়াল রাখবেন মক্কার মুশরিকগণ যেন বিষয়টি জানতে না পারে। সে জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিবেলায় তাদের সময় দিতেন।

রাতের শেষ প্রহরে সবাই এসে একত্রিত হতো। যেহেতু আনসারগণ সংখ্যায় অধিক ছিল, তাই দু'জন দু'জন করে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ভোরবেলা সূর্যের আলো কিরণ ছড়ানোর পূর্বেই ফিরে যেতো।

আরো দেখুন! "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যখন হিজরতের নির্দেশ আসে। তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর ঘরে (একটু বেশী) যাতায়াত শুরু করেন। এমনকি তিনি হযরত আবু বকর রা. এর ঘরে যাওয়ার জন্য একটা সময়ও নির্ধারণ করে নেন। সেই সময়টি ছিল ঠিক দুপুর বেলা; যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকত। (তাই আজও যদি আমরা কোন ঘরে একত্রিত হই, তাহলে বের হওয়ার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে নেব যে, আমরা কখন বের হব।) যাওয়ার সময় চেহারায় চাদর টেনে নিতেন, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে। সেখানে পৌঁছার পর কোন একটি কামরায় যেতেন। কামরায় ঘরের কেউ থাকলে তিনি তাকে বলতেন, তাঁর সাথে আমার একটু একান্ত আলাপ ছিল। ঘরের মানুষটি যখন বেরিয়ে যেতো এবং হযরত আবু বকর রাযি. বসতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে হিজরতের ব্যাপারে কথা বলতেন যে, আমাকে হিজরতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। ইত্যাদি" এমনি ছিল তাদের নিরাপত্তা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে নিরাপত্তা অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

হযরত আলী রাযি. কে নিজের বিছানায় শোয়ানো ও রাতে বের হওয়া, এসবই ছিল নিরাপত্তার অংশ। এছাড়া আরও যত প্রস্তুতি; তা সবই নিরাপত্তার অংশ ছিল।

আরো লক্ষ্য করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করতে বের হয়েছিলেন, তখন কি মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন নাকি মদিনার? অবশ্যই মদিনার উদ্দেশ্যে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করবেন মদিনায়। কিন্তু মদিনার পথে না গিয়ে গারে সাওরের পথে যান। আর গারে সাওর মদিনার পথে নয়। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার পথ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথ গ্রহন করেন। আর এমনভাবে সেখানে গিয়েছিলেন যে, কেউ ধারণাও করতে পারবে না যে, এ দিকে তিনি

গিয়েছেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে না গিয়ে ভিন্ন পথে গারে সাওরে পৌঁছালেন এবং সেখানে কিছু কাল অবস্থান করলেন। তারপর তিনি মদিনার পথে যান। একেই বলে নিরাপত্তা।

নিরাপত্তা বনাম তাওয়াক্কুল: সংঘাত না সমন্বয়

(নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এসে) অনেক সময় আমরা তাওয়াক্কুলের কথা বলি যে, আমাদের সবার তাওয়াক্কুল করা উচিত। অথচ আমরা কি চিন্তা করে দেখেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। আল্লাহর সাহায্য ও নেগরানীতে, আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির জন্যই তিনি কাজ করেছেন। অথচ আমাদের কত গোনাহ, ভুল-ত্রুটি। তাঁর সীরাত নিয়ে আপনি যত চিন্তা করবেন, দেখবেন- এত কিছুর পরেও তিনি নিরাপত্তা অবলম্বন করেছেন। উম্মতের জন্য এতে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে, আর তাওয়াক্কুলের মর্মও এটিই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে- خُذُوا حِذْرَكُم "তোমরা (নিরাপত্তার জন্য) সব ধরণের উপায়-উপকরণ অবলম্বন কর।" তাই তিনি নিরাপত্তা ও সতর্কতার কোন উপকরণ বাদ দেননি বরং নিরাপত্তার জন্য যত ধরণের উপায়-উপকরণের প্রয়োজন ছিল, সবই তিনি অবলম্বন করতেন।

আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা যদি কোন এক কাজ সম্পর্কে অবগত হই। তখন জিজ্ঞাসা করি, এখানে কি আল্লাহর মদদ আছে? আমি বলি, আল্লাহর মদদ ও সাহায্য আল্লাহর বিধান পালন এবং শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণের সাথে সম্পৃক্ত। শরীয়তের নির্দেশ خُذُوا حِذْرَكُم "তোমরা (নিরাপত্তার জন্য) সব ধরণের উপায়-উপকরণ অবলম্বন কর।" যখন আপনি শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন, জিহাদের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন আল্লাহ্

তা'আলার পক্ষ থেকে মদদ আসবেই। এজন্য এ বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, উপায়-উপকরণবিহীন তাওয়াক্কুল বস্তুত: (শরয়ী) তাওয়াক্কুলই নয়। এ ধরণের তাওয়াক্কুল আল্লাহর দরবারে আমাদের জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার সামনে যখন আমরা উপস্থিত হব, তখন আল্লাহ না করুন! যদি আমরা এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হই যে, তোমরা কেন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করোনি? তখন আমরা কি জবাব দিব? তাই পুনরায় বলছি- আল্লাহ তা'আলার হুকুমের কারণেই মানুষ উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী। একটি কথা মনে রাখি- আল্লাহ তা'আলার দু'টি নিয়ম রয়েছে। যথা: **এক.** শরীয়ত **দুই.** তাকবিনী। তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দুটোই গ্রহন করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, তাওয়াক্কুল হলো: উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর ফলাফল লাভের বিষয়টি আল্লাহর উপর অর্পণ করা। ফলাফলের জন্য মোটেও মন খারাপ না করা। কারণ হাদিসে এসেছে- তোমরা উপায়-উপকরণ অবলম্বন কর। যেহেতু ফলাফল লাভের বিষয়টি মানুষের হাতে নয়; বরং আল্লাহর হাতে, তাই আল্লাহর উপরই বিষয়টি ছেড়ে দাও। তাছাড়া উপায়-উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন এবং রাসূলের সীরাত থেকে ও বিষয়টি পরিস্কার যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেতন। উদাহারণস্বরূপ যুদ্ধে যাওয়ার সময় লৌহ বর্ম পরিধান করা, সওয়ার হওয়ার অবস্থাদি, খানা-পিনার হালাতসমূহ এবং সফরের সময় নিরাপত্তা অবলম্বন করা। যেমন যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, পূর্ব দিকে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে (প্রথমেই পূর্ব দিকে না গিয়ে) পশ্চিম দিক থেকে সফর শুরু করতেন। যেন সেখানে কোন গোয়েন্দা থাকলে, তার পক্ষে সঠিক কোন তথ্য দেওয়া সম্ভব না হয়। এ সবই ছিল উপায়-উপকরণ অবলম্বনের আদর্শ নমুনা।

আরও দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীদেরকে কেমন তারবিয়ত করেছেন? যা আজও আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি এক সাহাবীকে কিভাবে তারবিয়ত করেছেন তার নমুনা দেখুন- "জনৈক সাহাবী নিজ উষ্ট্রি না বেধে ছেড়ে দিয়ে রাসূলের কাছে এসে বলল। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তারই কাছে আমার উষ্ট্রিটিকে সোপর্দ করে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না! (এটা তাওয়াক্কুল নয়)। বরং তুমি প্রথমে গিয়ে উষ্ট্রিটিকে বাধ, তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।" এটাই হলো প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

ভাইয়েরা আমার! আরও দেখুন! রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু স্বীয় আদর্শ দিয়ে নিরাপত্তা শিখিয়েছেন বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি কুরআনেও এসেছে (যার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে)। অন্যদিকে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলেছেন-

إستعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها أو إستعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان

"তোমরা তোমাদের হাজত পূর্ণ করার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন কর।"

এ থেকে বুঝে আসে যে, যখন তোমরা কোন কাজ করতে চাও, তা গোপন রাখ- চাই সেটি জিহাদী কাজ হোক বা অন্য কোন কাজ। আমাদের সব কাজই তো জিহাদী কাজের অংশ। কোন কাজই জিহাদী কাজের আওতামুক্ত নয়। এই জন্য একজন আমাদেরকে খানা-পিনা ও ঘরোয়া বিষয়াদীর ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আমাদের খানা-পিনা সংক্রান্ত কোন ধরণের অসতর্কতার কারণে দুশমনের কাছে তথ্য চলে যেতে পারে। যেমন, এই ঘরে এই

এই সামানা যাচ্ছে, অথচ ঘরওয়ালারা এই সামানা ব্যবহার করে না। তাহলে মনে হয়, তাদের ঘরে মুহাজির রয়েছে। এই ধরনের সংবাদ তাদের কাছে যাওয়ার দ্বারা আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে? কত ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লাগবে? তাই আমাদের পুরো যিন্দেগী-ই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিল কিতমান তথা গোপনীয়তার বিষয়টি সকল মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য।

অন্য হাদিসে এসেছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন- فإن كل ذى نعمة محصود "নিশ্চয় প্রত্যেক নেয়ামতের অধিকারী ব্যক্তিকে হিংসার শিকার হতে হয়।" শয়তান অন্যের মনে তার প্রতি হিংসা সৃষ্টি করে। এ কারণে আপনি যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হন, তাহলে যেহেতু কুরআনে আছে- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿الضحى: ١١﴾ "এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।"(সূরা দোহা : ১১) সে হিসেবে আপনিও বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, যখন কোন নেয়ামত অর্জনে সময় ব্যয় হয় এবং তা গোপন রাখার মধ্যে কোন সমস্যা না থাকে বরং উপকারিতা থাকে, তখন তা গোপন রাখাই উত্তম।

আরও একটি বিষয় দেখুন! অনেক সময় আমাদের মাঝে যখন কথোপকথন হয়, কোন এক সাথী দু'একটি কথা বললে দেখা যায় তৃতীয় কোন সাথী তা শুনতে থাকে। অথবা যখন কারো কোন চিঠি আসে, তখন আমরা সেই চিঠিকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কোন শরয়ী প্রয়োজন বা জিহাদী প্রয়োজন ব্যতিরেকেই খুলে দেখি। আমরা খুলব না, ইনশা আল্লাহ। তবে আমি শুধু মাসআলাটি বর্ণনা করছি। কারণ তা অনেক বড় গুনাহ।

দেখা যায়- কোন সাথী কম্পিউটারে কিছু লিখছে, অন্য সাথী উঁকি মেরে দেখে; সে কি লিখছে? অথবা যিম্মাদার বা যিম্মাদার নয় এমন দু'জন মুজাহিদ সাথী পরস্পর কথা বলছে; জিহাদী বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে অথবা কোন জায়গায় স্থানান্তর হওয়া প্রসঙ্গে। তৎক্ষনাৎ শয়তান আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় ও খুব বেশী ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। শয়তান

বলে, একটু ওদিকে কান দাও... এমনটিই হয়। এটাও এক প্রকার গোপন বিষয় অনুসন্ধান। আর গোপন বিষয় অনুসন্ধান করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا...﴾ ﴿الحجرات: ١٢﴾ "আর তোমরা কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।"(সূরা হুজুরাত : ১২)

তাহলে বুঝা গেল, কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা নিষেধ। কিন্তু যখন একটা ঘটনা ঘটে, তখন জরুরী ভিত্তিতে কান সে দিকে খাড়া হয়ে যায়। অন্য দিকে তাকালেও কান সেদিকেই পড়ে থাকে। এদিকে আমি কাজ করছি বা কিতাব দেখছি, কিন্তু কান সে দিকেই পড়ে আছে। এভাবে আমার কাছে অনেক তথ্য একত্রিত হয়। আর যখন আমার কাছে তথ্যগুলো একত্রিত হয়, আল্লাহ না করুন! আল্লাহ না করুন!! আল্লাহ না করুন!!! যদি আমার গ্রেফতারীর পরীক্ষা চলে আসে, তখন কি অবস্থা হবে? কারণ আমরা সবাই জানি, যখন কেউ গ্রেফতার হয়, তখন তাকে বড় একটা ডায়েরী দেওয়া হয়। আর বলা হয়, জিহাদী কাজে তোমার যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং সে সময়ে যত তথ্য তোমার কাছে রয়েছে, সেসব তথ্য এখানে লিখে দাও। তখন সে তার জিহাদী জীবনের যত স্মৃতি আছে, সব সেখানে লিখে দেয়। তার স্মরণে যা ছিলো তা লিখে দেয়ার পর যখন সে বলে, আমার স্মরণে যা ছিলো, তার সব আমি লিখে দিয়েছি। তখন পুনরায় তাকে বাধ্য করা হয় যে, তোমার আরো যা যা স্মরণ হয়, তাও লিখ। যখন এ তথ্যগুলো তাদের হাতে চলে যায়। তখন বলা হয়, তুমি তো অমুকের সাথে ছিলে, অমুক থেকে যা শুনেছে তাও লিখ।

আমার ভাইয়েরা! আপনারা যত কথা শুনছেন, তা সবই আমানত। এটা জিহাদের আমানত। এ কারণে আমি যদি তখন বলি যে, আমি অমুক জায়গায় বসা ছিলাম। আমার পাশে দু'ব্যক্তি একথা বলছিল, আর আমি তা শুনছিলাম... এভাবে তখন স্মৃতিতে যা আসে, আমি যদি তাদের সব বলে দেই, তখন কি হবে? জিহাদের ক্ষতি হবে। অতিমাত্রার কঠোরতার কারণে

সেখানে আপনি লিখতে বা বলতে বাধ্য হবেন। এ বিষয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযি. এর একটি ঘটনা আমাদের সামনে আছে। অতিমাত্রার কঠোরতার কারণে হয়তো আপনার জন্য গোপন তথ্য প্রকাশ করা বৈধ হবে। কিন্তু এতে জিহাদের ক্ষতি হবে বা সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যই যদি আপনি কান লাগিয়ে এমন কথা শুনেন, যা আপনার কোন কাজে আসবে না। বরং যদি আপনি সে দিকে কান না দেন, তারপরও আপনার জিহাদ এবং যিন্দেগী খুব আরামে কাটবে। তথাপি যদি শুধু শুধু অপরের দোষ অনুসন্ধানের প্রতি আগ্রহের কারণে তার কথা শুনে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট আপনি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেন।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- (এ ব্যাপারে এই হাদিস অত্যন্ত ভীতিকর অবস্থার বর্ণনা দেয়)

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ... رواه البخاري

“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শুনে, অথচ তারা চাচ্ছেনা যে বিষয়টি ঐ ব্যক্তি শুনুক। তাহলে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেওয়া হবে।” (বুখারী)

ধরুন- দু’জন লোক কথা বলছে। আর তৃতীয় জন তাদের কথা শুনছে, অথচ তারা তা অপছন্দ করছে, এরপরেও সে শুনেছে। তাহলে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে। এটা কত বড় মারাত্মক বিষয় যে, সিসা গলিয়ে এমন ব্যক্তির কানে ঢেলে দেয়া হবে! তার কারণ, তারা দু’জন যখন কথা বলছে, তখন তৃতীয় ব্যক্তি তা শুনুক, তারা তা চায়নি। বিষয়টি একেবারেই তাদের নিজস্ব। কিন্তু এই লোক শুনেছিলো। অন্যদিকে চিঠি সম্পর্কিত তার কোন যিম্মাদারী ছিলো না (তারপরও সে লুকিয়ে দেখেছে)। জিহাদী বা শরয়ী কোন প্রকার যিম্মাদারীই তার ছিলো না, যে কারণে চিঠিটি পড়া তার জন্য বৈধ হতে পারতো। সে চিঠিটি এ জন্য পড়ে ছিলো যে, আজকাল লোকেরা কি চিন্তা করছে? শুধু তা জানার জন্য। তো এসব কিছুই এ হাদিসেরই অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

একজনের কম্পিউটার খোলা, লোকটি স্বীয় কাজে ব্যস্ত, কোন লেখা লিখছে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ জিহাদী কাজ করছে। যখনই কাজ থেকে মন সরে গেল, তখন দেখল যে, তিনি যা লিখছেন, তা একজন দেখছে। এটি স্পষ্টত: চোখের খেয়ানত। চোখের খিয়ানত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿غافر: ١٩﴾

"চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।" (সূরা গাফির [মু'মিন] : ১৯)

তাহলে বুঝা গেল- বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও ভয়াবহ।

নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু নির্দেশনা

ভাইয়েরা আমার! এরপর দেখুন! কথা হচ্ছে নিরাপত্তা সম্পর্কে। নিরাপত্তা অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেন ওয়াজিব? কারণ ফিকহী একটি কায়েদা (নিয়ম) আছে-

مالايتم الواجب إلابه فهو واجب

"যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয়না, তাও ওয়াজিব।"

একটি কাজ ওয়াজিব বা ফরজে আইন। (যেমন) জিহাদ ফরজে আইন। জিহাদ নামক এ ফরজে আইন যেহেতু নিরাপত্তা অবলম্বন ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই নিরাপত্তা অবলম্বন করাও ফরজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- خُذُوا حِذْرَكُم "তোমরা (নিরাপত্তার জন্য) সব ধরণের উপায়-উপকরণ অবলম্বন কর।" আর আমরা বলি, এটা কোন বিষয়ই নয়! তাহলে আমাদের এ জিহাদ কত দিন চলবে? দেখা যাবে কয়েকদিনের ভিতরেই এটি খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন, যারা দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকানদের শায়েস্তা করছেন, আর সারা দুনিয়াব্যাপী আমেরিকানরা তাদের পিছনে ঘুরছে এবং নিজেদের যত উপায়-উপকরণ

আছে, সব তাদের বিরুদ্ধে খরচ করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা (এত বছর পর্যন্ত আমেরিকানদের) তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দেননি। কেন দেননি? কি কারণে দেননি?

কারণ, আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম- خُذُوا حِذْرَكُمْ এর উপর আমল করে। সে অনুযায়ী তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছে, সতর্কতার জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে দারে আরকামের মত ঘর খোঁজেছে, তারাও সেভাবে খুঁজেছে এবং সেখানে গিয়ে থেকেছে। আলহামদুলিল্লাহ্! দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ সব উপকরণ অবলম্বনের তাওফীক তাদের দিয়েছেন। যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন, তারা দ্বীনের সাহায্য করেছে এবং জিহাদের কাজ করেছে। যদি তারা যে দিন নাইন ইলেভেন হয়েছে, সে দিন থেকেই বসে থাকতো, তাহলে বিষয়টি কেমন হতো? অনেকে বলে- নিরাপত্তা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই! নিরাপত্তা কি জন্যে? জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাব। একথা ঠিক নয়। নিরাপত্তা ও সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব বা ফরজ। আর এ ফরজের মধ্যে কোন ধরণের শিথিলতা, আল্লাহ তা'আলার কিতাব خُذُوا حِذْرَكُمْ এর হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক। এ শিথিলতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং তাঁর হাদিস إستعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان এর উপর আমলের পরিপন্থী।

আমার ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এমনভাবে তারবিয়ত করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা সবাই মনে-প্রাণে নিরাপত্তামনষ্ক হয়ে গিয়ে ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি.কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ জন সাহাবী দিয়ে বললেন, এই চিঠিটি নাও। তুমি এবং তোমার সাথীগণ দু'দিন সফর করার পর যেখানে পৌঁছাবে, সেখানে গিয়ে চিঠিটি খুলবে। দু'দিন পর্যন্ত চিঠিটি না খুললেও তাতে কি লেখা আছে? তা জানার ইচ্ছা তাদের সবার ছিল, তারপরও তারা খুলে দেখেননি।

কোন সাথীকে যদি বলা হয় যে, জিনিসটি রাখুন, এতদিনের পূর্বে খুলবেন না। তিনি কি না খুলে রেখে দিবেন? তাছাড়া যদি কোন সাথীকে কারো হাওয়ালা করা হয় এবং এর সাথে আমীর সাহেবকে বলা হয়, সাথীদের বলা যাবে না তারা কোথায় যাচ্ছে? তখন কি হয়? তখন বলা হয় আপনার কি আমার উপর আস্থা নেই? আমাকে কি আপনি গোয়েন্দা মনে করেন? আপনার কি মনে হয় আমি খেয়ানত করব? এত বছর হয়েছে, আমি হিজরত করেছি। এতদিন যাবৎ আমি জিহাদ করছি, অথচ আপনি আমার উপর আস্থাই রাখতে পারছেন না..!

এগুলো কত বড় আফসোসের বিষয়! আল্লাহর নবী চিঠিসহ সাহাবীদের পাঠিয়েছেন। অথচ আমীর-মামুর কারোরই জানা নেই, তারা কোথায় যাচ্ছে? মাশাআল্লাহ, তা সত্ত্বেও তারা রওয়ানা হয়ে গেছেন। দু'দিন পর্যন্ত সফর করার পর যখন তারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছালেন। তখন চিঠি খুলে দেখলেন, চিঠিতে লেখা আছে, কুরাইশের কাফেলা ঐদিক দিয়ে যাচ্ছে, তাদের পিছু ধাওয়া কর।

বস্তুত: কোন বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাকে বানিয়ে নেই। এখানে কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কারণ পাওয়া যাচ্ছে, যার কারণে সবাইকে বলতে হবে। আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের জিহাদের ক্ষতি করছি? এতে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুশমনের ফায়েদা হচ্ছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনাটি হয়তো সবাই জানি। সবাই কোন দিকে যাচ্ছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে বলেননি। এমনকি এক দু'জন ছাহাবা ব্যতীত অন্য সকল সাহাবার বক্তব্য হলো: তারা কোন দিকে যাচ্ছেন, তারা নিজেরাও জানতেন না। কি আশ্চর্য! রাসূলের সাহাবীগন মক্কা বিজয় করতে যাচ্ছেন, অথচ তাদের নিজেদেরও জানা নেই তারা কোথায় যাচ্ছেন? সীরাতের কিতাবে এসেছে- অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণের উক্তি ছিল, মক্কার নমুনা বা চিহ্ন যখন আমাদের নজরে এসেছে, তখন আমরা বলে উঠেছি, ও আচ্ছা! আমরা তাহলে মক্কা যাচ্ছি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং সাহাবাদের সীরাতের মাঝে আমাদের জন্য অনেক বড় বড় শিক্ষা রয়েছে।

নিরাপত্তা সম্পর্কিত কয়েকটি নীতিমালা।

যিনি নিরাপত্তা মেনে চলেন না তার প্রতি...!

আমাদের একটা বদস্বভাব হল: আমরা অনেকের প্রতি নিরাপত্তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হই এবং তার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করি। তাই আমি একটু পরে আলোচনা করব যে, নিরাপত্তা অবলম্বনকারীকে কি কি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে? আরও আলোচনা করবো যিনি নিরাপত্তা আবলম্বনকারীর প্রতি মনোকষ্ট পোষণ করেন এবং নিরাপত্তা অবলম্বন করতে নারাজ, তাকে কি কি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। (ইনশা আল্লাহ)

নিরাপত্তা অবলম্বনকারীর প্রতি যিনি মনোকষ্ট পোষণ করেন, তাকে বলবো, আপনি এর মাধ্যমে অযথা নিজের নেকী নষ্ট করছেন। বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে সুধারণা নিয়ে কাজ করুন। সুধারণা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ আমাদের নিকট পাপী হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার প্রতি বদধারণা রাখা বৈধ। তাই তার প্রতি বদধারণা রাখা যাবে। কিন্তু আপনি যদি দেখতে পান, কেউ জিহাদ করছে অথবা সে মু'মিন বা মুহাজির, তথাপি সে আপনার সাথে নিরাপত্তা বজায় রেখে চলে। তাহলে ভাই! আমি আপনাকে বলবো, আপনি তার প্রতি সুধারণা রাখুন। অযথা নিজের জিহাদ নষ্ট করবেন না, বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ছেড়ে দিন। কারণ লোকটি জিহাদের প্রয়োজনেই নিরাপত্তা মেনে চলছে। মন খারাপ করে হয়তো আপনি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিতে পারবেন কিন্তু তাকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। বিপরীতে তার মনই খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং এসব ব্যাপারে মূল নীতিমালা হলো: মুমিনের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। তবে কোন সুস্পষ্ট আলামত বা নিদর্শনের ভিত্তিতে যদি এর বিপরীত কোন বিষয় সুস্পষ্ট হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু আমরা যা করি তা হল, আমরা মু'মিন, মুজাহিদ এবং মুহাজির ভাইদের সাথে এমন আচরণ করি যে, সেখানে বদধারণা-ই হয়ে থাকে মূল বিষয়। তবে যদি এর বিপরীতে তার ভালো হওয়ার কোন দলিল-

প্রমাণ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়, তখন ভিন্ন কথা। এটা কত বড় আফসোসের বিষয়! এই নীতি তো কাফেরের জন্য। কোন মু'মিনের জন্য কখনোই এ নীতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রিয় ভাইয়েরা! উপরোক্ত নীতিমালাটি তার জন্য, যিনি নিরাপত্তা অবলম্বনকারীর প্রতি মনকষ্ট পোষণ করেন। যিনি নিরাপত্তা মেনে চলার কারণে দুঃখিত হন, পেরেশান হন। তার মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এই বলে যে, অমুক আমাকে সম্মান দেয় না, ইজ্জত করে না। আমাকে তার চেয়ে ছোট মনে করে। আমার কথা হল, আমার কেন এমন মনে হয় যে, আমার মনে যা আসে, তার সবই আসে কল্যাণের ফেরেশতার পক্ষ থেকে। অথচ শয়তান আমার সাথে আছে, আমার নফস আমার সাথে আছে! শয়তান এবং নফসের কাজ-ই হলো পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা। সে মহব্বত চায় না, সে একতা চায় না। এমনিভাবে সে কখনোই এটা চায় না যে, আমরা সবাই এক কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করি। সে আরো চায় না যে, মু'মিন একজন আরেকজনকে শক্তিশালী করবে। বরং সে চায় যে, মু'মিন একজন আরেকজনকে ছুড়ে ফেলবে। সে আমাদের সবার অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে। ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করার পর শুরু হয়-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿الحجرات: ١٢﴾

"মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"(সূরা হুজুরাত : ১২)

এ জাতীয় আয়াতগুলোর বিপরীতে বদগুমানী| তারপর শুরু হয় তার পরবর্তী ধারাবাহিকতা- শুরু হয় একে অপরের দোষ খোঁজা অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَا تَجَسَّسُوا "গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" আমি মনে করি, সে আমাকে তুচ্ছ ভাবে, সে আমাকে

এমন মনে করে, তেমন মনে করে। তারপর তার দোষ খোঁজা শুরু করি, তারপর দেখি যে, সে আমার বিরুদ্ধে আর কি কি করছে? এমনিভাবে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে সাথীদের বলছি- وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا "তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে গীবত না করে।" কিন্তু এদিকে আমরা গীবত শুরু করি। যখন গীবত শুরু হয়ে যায়, তখন মন ভেঙ্গে যায়। যখন মন ভেঙ্গে যায় তখন (আল্লাহই ভালো জানেন) আরো কত কিছু হয়..! যেমন আল্লাহ তা'আলার তাওফীক উঠে যায়, তার সাহায্য ও সহযোগিতা উঠে যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য উঠে যায়, তখন আমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয় না। বরং ক্ষতি হয় জিহাদের, ক্ষতি হয় উম্মাহর। যখন ক্ষতি হয় উম্মাহর, তখন তার দায় আমার ও আপনার উপরও বর্তায়। কারণ, এ ক্ষতির মূল কারণ আমার ও আপনার বদধারণা, কাজেই আল্লাহ তা'আলাকে আমি কি জবাব দিব?! এ ভেবে ভাইদের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন।

নিরাপত্তা ও সতর্কতা

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হল: আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের নিজেদেরই গুনাহের কারণে এবং সে একই কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হই, অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়, অনেক মা-বোন জেলে যায়। এ সবের মূল কারণ হল: নিরাপত্তা মেনে না চলা, নিরাত্তার প্রতি খেয়াল না রাখা।

আমার ভাইয়েরা, খেয়াল করুন! আমরা কেন ভুলে যাই যে, আমরা জিহাদের ময়দানে আছি। আমরা এমন সাধারণ কোন দাওয়াতী কার্যক্রমে বের হইনি যে, আমরা (স্বাভাবিকভাবে) অবাধে চলতে পারব, ঘুরতে পারব। আমরা তো তাদেরকে হত্যা করতে বের হয়েছি। আর তারাও আমাদের হত্যা করতে আমাদের মাথার উপর ড্রোন উড়াচ্ছে। তাদের আর আমাদের মাঝে যুদ্ধ চলছে। তারা আমাদের আনসারদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টারে করে ধরে

নিয়ে গিয়ে তাদেরকে মারছে আর বলছে যে, অমুককে তোমার ঘরে কেন আশ্রয় দিয়েছো কেন? (দেখা গেল) আশ্রিত লোকটি এক বছর আগে শহীদ হয়েছে। কিন্তু এক বছর পরও তারা আশ্রয়দাতার বাড়ি গিয়ে তার ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের বাচ্চাদের শহীদ করছে। আর বলছে- যে দু'একজন বেঁচে আছে, তারা কোথায়? তাদের নিয়ে আস। এভাবে আমাদের আনসারদের ঘর-বাড়ি সব ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত হবে না যে, আমার মন খুশি আছে, তাই যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব, যে ঘরে ইচ্ছা সে ঘরে ঢুকব। যে এলাকায় ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবো। আরে ভাই! এটা তো আমার শহর, আমার এলাকা বা আমার দেশ নয়। আমি তো এখানে জিহাদ করতে এসেছি। যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে এসেছে, তার জন্য এটা সাহসিকতা নয় যে, যখন যুদ্ধ চলবে, শুধু তখনই নিরাপত্তা অবলম্বন করবে। আর যখন সে তার বাড়ী ফিরে যাবে, তখন নিরাপত্তা অবলম্বন করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গিয়েও নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। সাহাবাগণ যখন হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখনও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তরবারী খাপে প্রবেশ করাননি। ইহুদী তো তখনও ছিল, তাই সে সময় তারা নিরাপত্তা অবলম্বন করেছেন। এখনও ইহুদীরা আমাদের মাথায় ঝেঁকে বসে আছে। তাই এখনো আমাদেরকে আমাদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরাপত্তা মেনে চলতে হবে।

নিরাপত্তা ও মনোকষ্ট

কেউ যদি আপনার সাথে নিরাপত্তা মেনে চলে। এর বিপরীতে আপনি তার সাথে তর্ক করেন বা তার বিরুদ্ধে কারো কাছে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, লোকটি নিরাপত্তা মেনে চলে, লোকটি আমাকে সম্মান দেয় না। আমি আপনাকে বলব- আল্লাহর কসম! যদি কেউ আমার

সাথে নিরাপত্তা মেনে চলে, আর আমি তাকে সাহস যোগাই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে আমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা এমনি বানিয়েছেন মানুষের স্বভাব। যদি আপনি তার সাথে তর্ক করেন এবং তাকে বলেন, তুমি নিরাপত্তা মেনে চল কেন? তাহলে তার অন্তরে আপনার মান-মর্যাদা হ্রাস পাবে। আর যদি আপনি তাকে সাহস যোগান, তাহলে তার অন্তরে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটা এই জন্যই আমি বলছি যে, যদি আপনি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, আর আপনার নিরাপত্তায় যেন ব্যঘাত না ঘটে সে বিষয়ের প্রতি আমি খেয়াল রাখি, তাহলে আপনার অন্তরে আমার মর্যাদা কমবে না বরং বাড়বে।

কত বড় বড় ব্যক্তিত্বকে দেখেছি! যাদের নিরাপত্তা অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও তারা নিজের চেয়ে তাদের সঙ্গীর নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশী সতর্ক থাকতেন।

সুতরাং নিরাপত্তা অবলম্বনকারী তো নিরাপত্তা অবলম্বন করবেনই। কিন্তু যিনি নিরাপত্তার করণে মনোকষ্ট পান, তিনি এ মনোকষ্টকে নেকী লাভের একটা সুযোগ মনে করতে পারেন। এছাড়াও তিনি এও মনে করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই ধৈর্যের কারণে আমাকে নেকী দিবেন এবং এতে জিহাদেরই লাভ হবে।

আরেকটি বিষয়ের জন্য আপনি কখনো আপনার মন খারাপ করবেন না। সেটি হলো: আগত লোকটির মর্যাদাগত অবস্থান কেমন? তার পরিচয় কি? তিনি যদি শহীদ হন বা গ্রেফতার হন, তাহলে উম্মতের কি ক্ষতি হবে? ধরুন! উসামা বিন লাদেন রহ. এসেছেন। আমি সতর্ক হলাম যে, একজন বড় ব্যক্তি এসেছেন (অথচ অন্যদের ক্ষত্রে আমার মাঝে তেমন সতর্কতা দেখা যায় না)। তাই আমি বলি মূল বিষয় হলো: এই যুদ্ধে যত ক্ষতি হচ্ছে, সে ক্ষতি কার? সে ক্ষতি উসামা বিন লাদেন রহ., আমীরুল মু'মিনীন এবং তার পুরো কাফেলারই ক্ষতি। এটা একা কোন ভাইয়ের ক্ষতি না।

আমার ভাইয়েরা! যারা আমাদের আনসারদের ক্ষতি করে; যে আনসারগণ আমাদের ভাষা বুঝে না, আমাদের কোন লিখনি পড়তে পারে না, আমাদের কোন বিষয়াষয়ও জানে না।

তারপরেও যখন তাদের উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মারপিট করা হয়, তাদের সন্তানদেরকে শহীদ করা হয়, তাদের ঘর-বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং এক/দু'বছর পরপর তাদের নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। আমি প্রশ্ন করি, এই ধরণের লোকদের ঘরে যে মুজাহিদ তৈরি হয় তিনি কে? তিনি কি উসামা বিন লাদেন রহ.? না, তিনি আমার আপনার মতই সাধারণ একজন মুজাহিদ ভাই।

ভাইয়েরা আমার! এ বাস্তবতা কেন আমরা ভুলে যাই?! আমেরিকানরা উম্মতের প্রত্যেক মুজাহিদকে ওসামা বিন লাদেন মনে করে। আমাকে আপনারা বলুন, আমাদের সামনে যে সাথীগণ বসে আছেন, তাদের গাড়িতে যে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে এবং তাদের যে ৭জন সাথীকে শহীদ করা হয়েছে। আর অন্যদের আহত করা হয়েছে, এরা কি উসামা বিন লাদেন রহ.? (তাহলে কেন এদের উপর বোমা বর্ষণ করা হলো?) নিরাপত্তা অবলম্বন কি শুধু উসামা বিন লাদেন রহ. করবে? আমি আপনি কি নিরাপত্তা অবলম্বন করব না? এই যে সাথীদের উপর তিনটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদের গাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, কিছু সাথীকে আহত করা হয়েছে, আর অপর কিছু সাথীকে শহীদ করা হয়েছে। এরা কি সবাই উসামা বিন লাদেন রহ.?

নিরাপত্তা কি শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য?

আমার ভাইয়েরা! এ কথাটিকে একটি শরয়ী কায়েদা (নীতি) মনে করবেন। কেউ যেন এটা মনে না করে যে, যিনি নিরাপত্তা অবলম্বন করছেন, তিনি শুধুই তার দেহ সত্ত্বাকে বাঁচানোর জন্য এটি করছেন। মনে রাখবেন, যখন থেকে আমি নিরাপত্তা অবলম্বন করছি, যদি সে

নিরাপত্তা শুধু শুধু নিজের এ দেহ সত্ত্বাকে বাঁচানোর জন্য হয় বা নিজের আরামের যিন্দেগী বা আয়েশী যিন্দেগীকে (যা কিছু দিনের জন্য আমার লাভ হয়েছে) হেফাজত করার জন্য হয়, তাহলে তা কখনোই নিরাপত্তা হতে পারে না। নিরাপত্তা হয় কোন কাজের জন্য خُذُوا حِذْرَكُم এর পর যে ف এসেছে, তা এসেছে পরবর্তী বুঝানোর জন্য। (বুঝা গেল! নিরাপত্তা গ্রহনের পর কোন কাজে নেমে পড়তে হবে) অর্থাৎ নিরাপত্তা হতে হবে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য।

আমরা যারা ঘরে বসে নিরাপত্তা অবলম্বন করতে চাই এবং বিলকুল চুপ থেকে কিছু দিন কাটিয়ে দিতে চাই। তাদের সবার নিয়ত থাকতে হবে যে, কামরায় বসে বসে চিন্তা ও পরিকল্পনা গ্রহন করব এবং এমন লক্ষ্য স্থির করব, যাতে কুফরের ক্ষতি হয়। যদি কারো এই নিয়ত না হয়। বরং নিয়ত হয়, আমি নিজেকে বাঁচাবো। তাহলে আল্লাহ না করুক! তার জিহাদই কবুল হবে না।

সুতরাং ভাইয়েরা আমার! যেহেতু আমাদের সবার চিন্তা এমন হওয়া উচিত। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে ওসামা বিন লাদেন মনে করা, আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা উমর মনে করা। আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা উমর রহ.কে দেখুন! কুফরের কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে তার দ্বারা। তা সত্ত্বেও তিনি কি তাদের কোন মিসাইলে শহীদ হয়েছেন? হননি। তিনি তাদের কোন গুলিতেও শহীদ হননি। তাদের যত গোয়েন্দা সংস্থা ছিল, তাদের যত উপায়-উপকরণ ছিল, সবকিছু অন্ধ হয়ে গেছে তার খোঁজে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। এটা তাদের জন্য চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা, তাদের প্রযুক্তির জন্য মারাত্মক অসম্মানজনক। আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা উমর রহ. তাদেরকে একটা নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন যে, যখন কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে, শরীয়তের উপর আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ রকমভাবেই সাহায্য করেন। শাহাদাত অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে শাহাদাত নসীব করেন। শাহাদাত ব্যতীত অপর কোন মৃত্যু যেন আমাদের না হয়। কিন্তু সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. এর মত বুযুর্গ মানুষকে

দেখান, যার মৃত্যু কেবল আল্লাহরই হাতে। পুরো আফগানিস্তান জুড়ে তারা অভিযান চালিয়েছেন, প্রত্যেক এক দু' কিলোমিটার পরপর তারা বোমা মেরেছে। যে বড় ব্যক্তিত্বের জন্য তারা বোমা মেরেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরীরে একটি গুলিও বিদ্ধ হতে দেননি। তার কারণ কি? তার কারণ তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আমল করেছেন- خُذُوا حِذْرَكُم এর উপর আমল করেছেন। যখন তিনি خُذُوا حِذْرَكُم এই নির্দেশের উপর আমল করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কসম! এটা একেবারেই বিস্ময়কর বিষয়! যখনই আমাদের ভাইয়েরা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাতে তাদের জন্য বারাকাহ দিয়েছেন।

আমি যখনই চিন্তা করি, হতভম্ব হয়ে যাই যে, যে স্থাপনাগুলোতে (কেন্দ্রসমূহে) আমরা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছি, আল্লাহ তা'আলা তাতে তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তারা সেখানে আমাদেরকে দেখতে পায়নি। আমরা আরো দেখেছি যে, যখন আমরা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছি, তখন তাদের পক্ষে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর সাহায্যের এটি একটা রাস্তা। আল্লাহর কসম! আমরা সব মুজাহিদীন যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না বুঝব যে, আমরা শুধু আল্লাহরই জন্য এবং শরীয়তের উপর আমল করার জন্যই এমনটি করছি। এই যে উপায়-উপকরণের ব্যবহার, এটা শরীয়তেরই একটা অংশ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (নিরাপত্তার জন্য) এটা ব্যবহার না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শরীয়তের উপর আমল হবে না। আমি পুনরায় বলছি- নিরাপত্তা গ্রহণের কারণে যে ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়, এ সব মূলনীতি তার জন্য প্রযোজ্য। তার কাজ হবে নিজের অন্তরে পাথর রাখা অর্থাৎ নিজের অন্তরকে শক্ত রাখা এবং নিজ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক আরও বেশী মজবুত করা।

নিরাপত্তা অবলম্বনকারীদের জন্য কয়েকটি নীতিমালা

প্রথমত: মু'মিন ভাইদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা। এটি ওয়াজিব। এর আগে একটি মূলনীতির কথা বলব। তা হলো: নিজ সত্ত্বাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। আমি নিজেকে বাঁচাবো না বা রক্ষা করবো না, এটা নিজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর। কারণ, আপনিও এই উম্মাহর একটি অংশ। এমনিভাবে আপনার সত্ত্বাটিও জিহাদী আন্দোলনের একটি অংশ।

১. নিজেকে বাঁচানো ও নিরাপত্তা

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো: নিজ সত্ত্বাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হবে, জিহাদকে বাঁচানো। যেহেতু জিহাদকে বাঁচানোর জন্য এবং জিহাদকে শক্তিশালী করার জন্য নিরাপত্তা অবলম্বন করা জরুরী। সেহেতু আপনার মন-মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, যদি আমি আমার নিজ সত্ত্বার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা অবলম্বন না করি, এতে শুধুমাত্র জিহাদেরই ক্ষতি হবে না। বরং আমার মা-বাবা, আমার ভাই-বোন, আমার আনসার ও তার সন্তানগণ এবং ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের আমাদের যে সম্মানিত ভাইয়েরা আছেন, সবার ক্ষতি হবে।

লক্ষ্য করুন! শাহাদাত আমরা সবাই চাই। আমরা অন্তর থেকেই দুআ করি- আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের কাউকে শাহাদাত থেকে বঞ্চিত না করেন এবং আমাদের সকলকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। কিন্তু এটা কি পরিতাপের বিষয় নয় যে, আমাদের অসতর্কতা হেতু আমেরিকান বাহিনী সাথীদের উপর আক্রমণ করার ফলে ইমারাতের কিছু সাথী শহীদ হয়ে গেল। যখন এমন হবে, তখন আমাদের অসতর্কতা ও অলসতার কারণে কি আমরা পাপী হব না? আমাদের কারণে ইমারাতের সাথীদের ক্ষতি হয়। আমি আবারও বলছি- আপনি লক্ষ্য করে দেখুন! যেখানে যেখানে ইমারতের সাথীগণ আমাদের ভাইদের সাথে শহীদ হয়েছেন

এবং উপর থেকে ড্রোন এসে আক্রমণ করেছে ও ক্ষতি হয়েছে, সেই সাথী কি উসামা বিন লাদেন রহ. ছিলেন? না, বরং আমাদের একজন সাধারণ সাথীই ছিলেন।

যেহেতু তারা আমাদের সাধারণ সাথীদেরকেও আক্রমণ থেকে বাদ দেয় না। তাই আমাদের সাধারণ সাথীদের জন্যেও আবশ্যক হলো: জিহাদকে ক্ষতি থেকে বাচাঁনোর জন্য স্বীয় নিরাপত্তা অবলম্বন করা, নিজের ক্ষতির কথা চিন্তা করা।

আরেকটি মূলনীতি সবার স্মরণ রাখা উচিত। মূলনীতিটি হলো: আমাদের মধ্যে যদি কেউ যুদ্ধে যায় এবং যুদ্ধ পোশাক ফেলে দিয়ে একাকী শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে তা খুবই ভালো। আপনারা হয়তো সীরাত গ্রন্থে পেয়েছেন যে, এক সাহাবী স্বীয় যুদ্ধ পোশাক ফেলে দিয়ে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়ে লড়াই শুরু করেন। স্পষ্টত: তা একেবারেই জায়েয। কিন্তু কেউ যদি এই বলে যুদ্ধ পোশাক ফেলে দেয় যে, আমি নিরাপত্তা অবলম্বন করবো না। কারণ, সাহাবাদের মধ্য থেকেও কোন এক সাহাবী এমনটি করেছেন। তা ঠিক হবে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ঘটনাটি কখনোই সাহাবা কর্তৃক নিরাপত্তা অবলম্বন না করার দলিল নয়। ট্যাংক আসছে, আর আপনি যুদ্ধ পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে ফায়ার শুরু করলেন, সেটা খুবই ভালো। তা দ্বারা মানুষের সাহস তৈরী হবে। আমার এই দেহ সত্ত্বার যিম্মাদার তো আমি। কিন্তু আমার দল, আমার আমীর, আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, আমার আনসার ভাইগণ এবং ইমারাতে ইসলামীয়ার তালেবান ভাইগণ, তাদের সবার যিম্মাদারও কি আমি? (না, কক্ষনো না।)

সবার পক্ষ থেকে আমার আপনার উপর এই যিম্মাদারী রয়েছে যে, আমরা নিরাপত্তা মেনে চলব। আর যখন আমি নিজেই এ ব্যাপারে অলসতা করি। যার ফলে আমার পুরো এলাকার মানুষ কষ্ট পায়। তো আল্লাহ না করুন! আল্লাহ না করুন!! এটা তখন অনেক বড় মারাত্মক বিষয় হবে যে, যখন আমরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব, তখন আমাদেরকেই জবাবদিহি

করতে হবে। বলা হতে পারে, জিহাদে এসেছো, সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু তুমি خُذُوا حِذْرَكُم আয়াতের উপর আমল করনি কেন? তখন আল্লাহ তা'আলাকে কি জবাব দিব?

তাহলে প্রথম কথা হলো: নিজের দেহ সত্ত্বাকে রক্ষার জন্য নয় বরং জিহাদী আন্দোলকে রক্ষার জন্য নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। ব্যক্তিগতভাবে আমার দুশমনের সামনে সরাসরি দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। কিন্তু অন্যদের যে ক্ষতি এর সাথে জড়িয়ে আছে, সে জন্য আমরা এমনটি করবো না।

এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আরেকটি কথা: আমাদের প্রতিটি ভাই যার শিকার, খোদ আমিও যার শিকার, তা হলো: শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তান আশ্চর্যজনক পন্থায় মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বেশী পরিমাণে হওয়ায় অনেক সময় আমরাও যার শিকার হয়ে যাই। এই যে অনেক সময় আমরা বলি, আমরা শহীদ হয়ে যাব। শহীদ হওয়া অনেক খুশির কথা। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ভুখণ্ডে; এই উপমহাদেশে এমন একটা সময়ের আগমন ঘটছে, যখন আমাদের এই কাফেলার ছোট থেকে ছোট একজন ভাইয়েরও অনেক বড় অবদান থাকবে। একটা সময় এমন আসবে যখন আল্লাহ তা'আলা আপনাদের দ্বারা তার দ্বীনের অনেক বড় খেদমত নিবেন। এই যে এত কড়াকড়ি, যা আমরা চতুর্দিক থেকে লক্ষ্য করছি। এর দ্বারা মনে হচ্ছে, কোন দিক থেকেই আশা জাগানিয়া কিছু পাচ্ছি না। যেমন হয়েছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, সাহাবাদের সময়ে। তখন একটা সময় এমন অতিবাহিত হয়েছিল যে, বছরকে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুধুমাত্র দু'তিন জন লোক ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। এক দিকে নৈরাশ্যের কারণে সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলতো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাদের জন্য দু'আ করছেন না? সাহাবাদের এসব কথা শুনা মাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক ক্রোধান্বিত হয়ে যেত। ফলে তিনি বলতেন- ولكنكم تستاجرون "তোমরা তো দেখছি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করো।"

অনেকের একটাই টার্গেট থাকে, সে শহীদ হবে। শাহাদাতের এই যে আকাঙ্খা ও তামান্না; যদি শাহাদাত না হয় (তো আল্লাহ না করুন!) যেন তার জিহাদই কবুল হয়নি! আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানে এবং মনে সকাল-সন্ধ্যা সবসময় আল্লাহর কাছে কামনা করা উচিত যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শাহাদাত দান করুন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, মু'মিন যখন জিহাদে আসে, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দু'টো। **(এক)** ব্যক্তি হিসেবে। এ হিসেবে তার উদ্দেশ্য হবে, যা হাদীসে বলা হয়েছে-

لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ

"আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিহত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমার কাছে এটা বেশী প্রিয় যে, পুনরায় জিহাদ করি এবং নিহত হই, আবার জিহাদ করি এবং নিহত হই।"(সহীহ মুসলিম)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা তিন বার বলেছেন। সর্বশেষেও فَأُقْتَلَ "আমি নিহত হই" বলেছেন। জীবিত হওয়ার কোন কথাই বলেননি। এর দ্বারা বুঝা গেলো শাহাদাতই ব্যক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মালে গনীমত আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য শাহাদাতই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সুনিশ্চিতভাবেই কোন জিহাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কখনোই নিহত হওয়া বা শাহাদাত নয়। তবে হ্যাঁ! একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হতে পারে শাহাদাত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য শাহাদাত, ঠিক আছে। যেহেতু এর মাধ্যমে মানুষের শাহাদাত লাভ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অকাট্যভাবেই জিহাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো: শাহাদাত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জিহাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুসলিমার জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। তা হলো:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ... ﴿البقرة: ١٩٣﴾

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।"(সূরা বাকারাহ: ১৯৩)

হে উম্মাতে মুসলিমা! উঠে দাঁড়াও, ক্বিতাল কর। وَقَاتِلُوهُمْ এটা جمع এর সিগাহ্, যা বহুবচনের জন্য আসে। অর্থাৎ হে মুসলমানের জামাত! উঠে দাঁড়াও, ক্বিতাল কর। ক্বিতাল বা যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? জিহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কি এটা যে, আস! শহীদ হয়ে যাও? না! সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো- حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ "যেন ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।"

সুতরাং এই জিহাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো: কাফিরদেরকে পরাজিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। এমনিভাবে আমাদের এই জামাতের উদ্দেশ্য হলো: ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে বিজয়ী করা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে জিহাদী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারপর তাকে বিজয়ী করা। উম্মাতে মুসলিমার মাজলুমদের সাহায্য করা। আমাদের এ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেহেতু আমাদের এ জিহাদের উদ্দেশ্য অনেক মহৎ, তাই আমাদের উচিত- এ জিহাদী আন্দোলন নিয়ে একটু চিন্তা করা। আমি আশা করি এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, এক সময় এই কাফেলাই বিজয় হবে। তাই এই কাফেলাকে কদর করুন, মূল্যায়ন করুন।

আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় সাহায্য যে, আপনারা আল্লাহর আশ্রিত জমিনে আছেন। দায়েশের মত এখানে না আমেরিকার ছত্রছায়া আছে, আর না অন্য কারো ছত্রছায়া। আলহামদুলিল্লাহ! শুধুমাত্র আল্লাহর আশ্রয়ে আছেন। আর যখন আল্লাহর আশ্রয়ে আছেন, তখন এ কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এমন একটি সময়ের জন্য প্রস্তুত করছেন; যখন আপনাদের প্রতিটি সদস্য দ্বারা অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিবেন এবং এই দ্বীনের সাহায্য করবেন। তাই আপনি নিজেকে নিজে হেফাজত করুন। যতটুকু সুযোগ আপনার হাতে আছে, ততটুকু সুযোগ কাজে লাগান। হোক না কামরার ভিতরে তাতে কি হয়েছে? তারপরও পরিকল্পনা গ্রহন করুন যে, কিভাবে আমি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে পারি? কিভাবে দাওয়াতের কাজ করতে পারি? কিভাবে স্বীয় ঈমান ঠিক করতে পারি?

কিভাবে আমার দোষ-ত্রুটি, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার এবং আমার আনসারদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারি? তারপর যখন আমি বিভিন্ন কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে যাব, তখন কিভাবে আঞ্জাম দিব? জিহাদের ই'দাদ বা প্রস্তুতি কিভাবে নিব? পাকিস্তানের ভিতর আমাদের যে সব লোকেরা আছেন, আমরা তাদের পর্যন্ত দাওয়াত কিভাবে পৌছাব? এ কাজগুলো তখন করব, যখন কামরায় থাকবো। আর যখন বাহিরে বের হওয়ার সুযোগ হবে, তখন তো বাহিরের কাজ করব। কিন্তু নিরাপত্তায় যেন কোন উদাসিনতা না আসে। এটা শেষ কথা ছিলো, আর প্রথম কথা ছিলো নিজ দেহ সত্ত্বা সম্পর্কে। তাই শুধু নিজের জন্য নিরাপত্তা নয়, বরং জিহাদী আন্দোলনের জন্য নিরাপত্তা অবলম্বন করতে হবে।

২. কাউকে অবজ্ঞা করা ও নিরাপত্তা

দ্বিতীয়ত: আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। সেটা হলো: নিরাপত্তা অবলম্বন করতে গিয়ে কোন সাথীকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। হাদিসে এসেছে-

بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. رواه مسلم

“কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই যথেষ্ট।”(সহীহ মুসলিম)

কাজেই নিরাপত্তা অবলম্বনের নামে কোন ভাইকে অবজ্ঞা করা যাবে না। যদি এমনটি করা হয়, তাহলে আমার আপনার; আমাদের সবার দ্বীন এবং জিহাদ সব বরবাদ হয়ে যাবে। তাই নিরাপত্তা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এমনভাবে চলার চেষ্টা করতে হবে, যেন আমরা নিরাপত্তা বজায় রেখে চলতে পারি এবং যে কোন পন্থায় স্বীয় ভাইকেও আশ্বস্ত রাখতে পারি। এটা করতে হবে মুহাব্বতের সাথে, এটা দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়। এমন যেন না হয় যে,

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে কারো মন ভেঙ্গে গেলেও কোন সমস্যা নেই। এটা খুবই খারাপ কথা। আমাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। চাই তার মন যেমনি থাকুক না কেন? এটা ঠিক নয়। বরং আমাকে উভয়টি করতে হবে। নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। আবার অপর ভাইকেও নাখোশ করা যাবে না, বরং সন্তুষ্ট রাখতে হবে। যদি কোন কারণে সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনি তাকে বলতে হবে যে, আরে ভাই! 'দয়া করে নাখোশ হবেন না।' এই বিষয়টির প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে।

৩. মিথ্যা বলা ও নিরাপত্তা

তৃতীয়ত: নিরাপত্তা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। তা হলো: মিথ্যা বলা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা যে সব গুনাহের জন্য লা'নত করেছেন, সে সবের মধ্যে মিথ্যাও অন্যতম একটি গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿النور: ٧﴾

"যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহর লানত।"(সূরা নূর : ০৭)

হাদিসে এসেছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিন কি অমুক গুনাহ করতে পারে? মু'মিন কি অমুক গুনাহ করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতে পারে। প্রশ্ন করা হলো, মু'মিন কি মিথ্যা বলতে পারে? তিনি বললেন, না।

তাই আমাদের সদা-সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, মিথ্যা বলা হারাম। মিথ্যা বলা মু'মিনের কাজ নয়। ঈমান এবং মিথ্যা কখনো একত্রিত হতে পারেনা। তাই মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলা যাবেনা। তবে কিছু অবস্থায় যে মিথ্যা বলা জায়েয, তা প্রয়োজনের খাতিরে। তাও আবার শরয়ী নিয়মনীতি অনুসারে এবং সুস্পষ্ট কারণে। আমার ধারণা মতে, যদি কোথাও নিরাপত্তাজনিত কারণে মিথ্যা বলা বৈধ হয়। তাও এ

মূলনীতিগুলোর আলোকেই হবে। ইনশা আল্লাহ বিষয়টি সামনে আসবে। আমি পুনরায় বলছি- এ সংক্রান্ত যত কথা আছে, সেসব কথা ঐ সকল ভাইদের জন্য যারা নিরাপত্তা অবলম্বন করাকে জরুরী মনে করবে। যে ব্যক্তি নিরাপত্তা অবলম্বনের কারণে মনে ব্যাথা পায়, তার জন্য সবর ব্যতীত আর কোন প্রতিষেধক নেই। নেকধারণা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। আল্লাহর কাছে নেকীর প্রত্যাশা ব্যতীত আর কোন কথা নেই।

যদি বড় কোন সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সমাধানের পথ হলো: কারো কাছে অভিযোগ না করে; আমীরকে জানানো যে, আমার সাথী ভাই এটা করেছে। এ অভিযোগটিও যখন সে করবে, তখন তার ভাইয়ের সংশোধনের লক্ষ্যে করবে। এজন্য নয় যে, তার হৃদয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সে আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আমরা আমাদের ভাইদের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল হবো। যেহেতু আমাদের হৃদয় অনেক প্রশস্ত। পরিতাপের বিষয় হলো: স্বীয় ভাইদের ব্যাপারে অন্যদের মন প্রশস্ত থাকে। কিন্তু আমাদের হৃদয় প্রশস্ত থাকে না। আমি পুনরায় সে সব ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলব- যারা নিরাপত্তা মেনে চললে মনে ব্যাথা পান, আপনারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য সবর করুন। এ ঘটনাটির প্রতি একটু লক্ষ করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনসারী সাহাবাগন এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুহাজিরীনরা এটা পেয়েছে, আর আমরা এটা পেয়েছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সবরের দীক্ষা দিয়েছেন। এমনকি এটাও বলেছেন যে, আগেও আমি তোমাদের সাথে ছিলাম। সুতরাং তোমরা হাউজে কাউসারে আমার অপেক্ষা করবে, সেখানে আমাকে পাবে।

তো মনোকষ্টে পতিত হওয়ার পরিপেক্ষিতে যে পরীক্ষা আসে, সে পরীক্ষা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই আমাদেরকে সবর করতে হবে। এখন বিষয় হলো: বিপদে পতিত এ ভাইটি কি করবে? স্মরণ রাখতে হবে যে, জিহাদের মধ্যে একটা মৌলিক ব্যাপার হলো: মিথ্যাকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করা। এ নীতিটি ভালভাবে স্মরণ রাখবেন। অনেক পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন সাথী হাসি-তামাশার ছলে বলে, ‘যদি জিহাদ না থাকতো, তাহলে মিথ্যা বলা হারাম হয়ে

যেত।' যেন জিহাদের জন্য সব মিথ্যাই হালাল হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ! অনেকে নেকী অর্জনের জন্যও মিথ্যা বলে!

এজন্য প্রিয় উপস্থিতি! এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি যদি নিরাপত্তা অবলম্বনের নামে মিথ্যা বলি। আর আমার সম্মোধিত ব্যক্তিটি দেখে আমি মিথ্যা বলছি, তাহলে এতে সে ফিতনায় পতিত হবে এবং বলবে এখানে দেখছি সবাই মিথ্যাবাদী! আর যিনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি নিজেই তো দ্বীনের উপর আমল করছেন না। অনেক সময় আমাদের অনেক নতুন সাথী আসে, যারা নিরাপত্তা সম্পর্কিত আলিফ-বা-তা-ছা কিছুই পড়েনি। সে যখন স্পষ্ট দেখে, সাথীরা মিথ্যা বলছে, তখন সে ভাবে যে, সে একটা মিথ্যার দলে এসে ভিড়েছে। ওখানে তো আমার মা-বাবা সবাই বলেন, মিথ্যা বলো না। আর এখানে আমীরগণসহ সবাই মিথ্যা বলে। এজন্য কখনই মিথ্যা বলা নিরাপত্তা নয়। তাও আবার এমন মিথ্যা বলা হচ্ছে, সে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখছে যে মিথ্যা বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো: মিথ্যা বলা হারাম। মন এবং দেমাগকে কোনভাবেই মিথ্যা বলতে দেয়া যাবে না। তাহলে আমরা যে যুদ্ধ-জিহাদে আছি, প্রয়োজন হলে আমরা কি করব? এ ক্ষেত্রে একটি কাজ করা যায়। যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন আলিমেরই দ্বিমত নেই। তা হলো: তাওরিয়া অবলম্বন করা। তাওরিয়া ইসলামে একটি বৈধ বিষয়। তাওরিয়া হলো- (যেমন) আমি আপনার সামনে একটা শব্দ বললাম। আমার মন ও দেমাগে সে শব্দ দ্বারা এক অর্থ উদ্দেশ্য। অথচ আপনার মনে শব্দটির আরেক অর্থ ঘুরপাক খায়। যেমন আমি বলছি, আমি শবারগানের দিকে যাচ্ছি। আমি দেখেছি, এক ভাই অন্য এক ভাইকে বলছে যে, আমি অমুক শহরে যাচ্ছি। শহরের নামই নিয়ে নিচ্ছে যে, আমি অমুক শহরে যাচ্ছি। তার জন্য ঐ শহরের নাম নেওয়াই ঠিক হচ্ছে না। আপনি যদি এর সাথে একটি 'কি তরফ' অর্থাৎ দিকে শব্দ যুক্ত করেও বলেন যে, আমি অমুক শহরের দিকে যাচ্ছি। তাহলে আপনার কথা সহীহ হয়ে হয়ে যাবে। আপনি আরো লক্ষ্য করুন! আমি বললাম, আমি কান্দাহার যাব, আমি এদিকে যাব, আমি অমুক জায়গায় যাব, এভাবে বলাই ভুল। আমি কান্দাহার যাব কথাটাই ভুল। কাবুল যাচ্ছি এ কথাও

ভুল। পেশাওয়ার যাচ্ছি এ কথাও ভুল। এভাবে বলবেন না, এভাবে বলাটা মিথ্যার ভিতরে পড়ে। এভাবে বলুন যে, আমি করাচির দিকে যাচ্ছি। আমি লাহোরের দিকে যাচ্ছি। লাহোরের দিকে যাওয়া কালীন যদি আমি কামরার দিকেও যাই, তবুও লাহোরের দিকেই যাচ্ছি। তাই কথাটিকে ভুল বলার সুযোগ নেই। যদি নিরাপত্তার স্বার্থে এক জায়গার নাম নিয়ে সম্ভাব্য দু'অর্থের মধ্য থেকে যে কোন একটা অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যাতে কেউ বুঝতে না পারে, আমি কোথায় যাচ্ছি। তাহলে এটা নিরাপত্তা অর্জনের জন্য হওয়ায় খুশির বিষয়। কিন্তু মিথ্যা থেকে বাঁচার স্বার্থে 'দিকে' শব্দটি লাগাত হবে। তাওরিয়া কি? এটাই তাওরিয়া। দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাযি. যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কেউ একজন হযরত আবু বকর রাযি.কে জিজ্ঞাসা করল, উনি কে? হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. বললেন, উনি আমার রাহবার। যাকে বলা হলো তিনি কি বুঝলেন? তিনি বুঝলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রাস্তা বলে দিচ্ছেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি.এর মনে ছিল, তিনি আমাকে জান্নাতের রাস্তা দেখান, আমাকে দ্বীনের পথ দেখান, দ্বীন শেখান। এটা হলো তাওরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ! সে পরিভাষা এখন আমাদেরও পরিভাষা। যখন আমাদের কোন স্থানীয় সাথী আমাদেরকে কোন জায়গায় নিয়ে যায়, তখন আমরা বলি, উনি আমার রাহবার। উনার রাস্তা সম্পর্কে ভালো জানা-শুনা আছে। দেখুন! একজনের মনে এক অর্থ উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্যজনের মনে আরেক অর্থ উদ্দেশ্য। আরও দেখুন! দ্বিতীয় উদাহরণ হলো: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সম্ভবত: বদর যুদ্ধে শত্রুদের নিকটবর্তী জায়গায় সৈন্যসহ ছাউনি ফেললেন। তখন এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? যেভাবে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? তো আমরা সোজা আমাদের এলাকা বা শহরের নাম বলে দেই। অথচ এলাকা বা শহরের নাম বলা হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, হতে পারে। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সীরাতে আজ আমরা যে যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করছি, সবগুলো পর্যায়েরই দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ) তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- نحن من الماء "আমরা 'মা' থেকে এসেছি।" 'মা' ছিল শামের একটা দূরবর্তী এলাকার নাম। লোকটি বলল, আচ্ছা! আপনারা এত দূর থেকে এসেছেন। মূলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আমরা পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿الطارق: ٦﴾

"সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।"(সূরা ত্বারিক : ৬)

এটাকে তাওরিয়া বলে। তাওরিয়া সকল ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে জায়েয। তাই আমাদের তাওরিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তাওরিয়া অবলম্বন করা উচিত, কারণ তাওরিয়া জায়েয। তাওরিয়ার জন্য ভিন্ন কোন মাসআলার দরকার নেই। মিথ্যা সম্পর্কে নীতি হলো- সুস্পষ্ট মিথ্যা মূলগতভাবেই হারাম। কিন্তু কখনো তা বৈধ। আবার কখনো ওয়াজিবও হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি আছে? নিয়ম-নীতিগুলো রদ্দুল মুহতার নামক বিখ্যাত ফিকহের কিতাবে বিন্যস্তভাবে লেখা আছে। রদ্দুল মুহতারের লেখক বলেন-

واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب.

"জেনে রেখ! মিথ্যা বলা কখনো জায়েয, আবার কখনো ওয়াজিব।"

তারপর তিনি এর শর্তগুলো উল্লেখ করছেন-

أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليها بالكذب والصدق جميعا فالكذب فيه حرام.

"প্রত্যেক এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা সত্য-মিথ্যা উভয়টি দ্বারাই হাসিল হয়। এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা হারাম।"

এরপর বলেন-

وإن امكن التوصل اليه بالكذب وحده فمباح إن ابيح تحسين ذالك المقصود.

"যদি শুধুমাত্র মিথ্যা দ্বারাই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তাহলে এ মিথ্যা বলা বৈধ। তবে এ শর্তে যে, সে যা অর্জন করছে, তা বৈধ হতে হবে।"

অর্থাৎ একটি বস্তু যা লাভ করা বৈধ। এখন যদি তা অর্জনের জন্য আমি সত্য বলি, তাহলে তা থেকে বঞ্চিত হব। এমতাবস্থায় যেহেতু সে জিনিসটা অর্জন করা বৈধ। তাই তা অর্জন করার জন্য মিথ্যা বলাও বৈধ।

তারপর আরো বলেন-

وواجب إن وجب تحصيله

"মিথ্যা বলা ওয়াজিব, যদি সে বস্তুটি হাছিল করা ওয়াজিব হয়।"

অর্থাৎ যা অর্জন করা ওয়াজিব। তা যদি কোনভাবেই মিথ্যা বলা ব্যতিত অর্জন করা না যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে হলেও তা হাছিল করা ওয়াজিব। তিনি উদাহরণ পেশ করে বলেন- জালিম থেকে স্বীয় মুসলমান ভাইকে হেফাজত করা ওয়াজিব। কোন জালিম যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপর জুলুম করে। যার ফলে নির্যাতিত মুসলিম ভাইটি দৌঁড়ে এসে যদি কোন মুসলমানের কামরায় ঢুকে পড়ে, তখন আপনি যদি বলেন যে, আমাকে তো সত্য বলতে হবে, তা ঠিক হবে না। কারণ এখানে মুসলিম ভাইটিকে হেফাজত করা ফরজ। তাই আপনার জন্য মিথ্যা বলাও এখানে ফরজ। এখানে যদি আপনি সত্য বলেন, তাহলে গুনাহগার হবেন।

এ আলোচনা একটি মূলনীতি। এই মূলনীতির সারকথা হলো: সর্বাবস্থায় আমরা সবাই মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকব। চেষ্টা করব প্রয়োজন হলে যেন তাওরিয়া করতে পারি। তারপরও যদি কোথাও মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়ে পড়ি, তাহলে মিথ্যা সংক্রান্ত মূলনীতি তো এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তা অনুসরণ করব। (ইনশা আল্লাহ)

সর্বশেষ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করার পর আমার আজকের আলোচনার সমাপ্তি টানব, ইনশা আল্লাহ।

আমার ভাইয়েরা! তা হলো: আমরা যে জিহাদে আছি, এখানে দুশমন প্রতিটি মুজাহিদের পিছনে লেগে আছে। তাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেককে শহীদ করা এবং যাদেরকে সম্ভব জীবিত গ্রেফতার করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন এবং আমাদের বন্দী ভাইদের মুক্তি দান করুন (আমীন)। যুদ্ধে মালুমাত তথা তথ্য জানার গুরুত্ব অনেক। তথ্য-উপাথ্য অর্জন করা আমাদের দুশমনদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি যখন আফগানিস্তানে এসেছি, তখন আমেরিকান একজন লোক কোন এক টিভি চ্যানেলকে ইন্টারভিউ দিয়েছিল, যা আমি শুনেছি। ইন্টারভিউতে সে বলেছিল, আমরা যদি প্রথমেই তাদের ড্রোন মেরে হত্যা করি, তাহলে তারা মারা যায়। তবে এর চেয়ে একটু পিছনে গেলে (অর্থাৎ জীবিত গ্রেফতার করতে পারলে) আমাদের লাভ বেশী। অর্থাৎ তখন তাদের থেকে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। এর উদাহরণ হলো এই যে, কম্পিউটার ইত্যাদি যা কিছুই তারা জব্দ করতে পারে, তা থেকেই তাদের বিভিন্ন প্রকারের তথ্য-ভান্ডার অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? এ ব্যাপারে এই হাদিসটি আমাদের ভাইদের সামনে থাকা উচিত-

من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.

"ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো: অহেতুক সব বিষয় বর্জন করা।"(সুনানে তিরমিযী)

একটি কথা খুব ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে, যে বিষয়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, সে বিষয়ে তথ্য না নেওয়া। যে কথার সাথে আমার কাজের কোন সম্পর্ক নেই, তা শুনব কেন? তা পড়ব কেন? এটাই উত্তম ইসলাম, এর উপরই আমাদের সকলের আমল করা

উচিত। লক্ষ্য করুন! আমরা কি করি? আমরা সমস্ত তথ্যভান্ডার জমা করি। অথচ নিরাপত্তা নিশ্চিত করি না। আর যদিওবা নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। তারপরও তা জিহাদের ক্ষতি-ই করে। তাই আমাদের বিভিন্ন তথ্য জমা করার আগ্রহকে অন্তর থেকে বিদায় করে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ব্যাপকভাবে আমাদের মাঝে একটা মূলনীতির চর্চা হয়ে আসছে, যা শতভাগ ভুল। যত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আছেন, তারা তাদের বই-পুস্তকে মূলনীতিটি এভাবে লিখেছেন যে, আমি আমার সাথীকে সব বিষয় বলতে পারব। শুধু সে বিষয় ব্যতীত যা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা ভুল মূলনীতি, যা শতভাগ ভুল। অথচ আমরা সবাই এই মূলনীতির উপর চলি। আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলেছি। এও বলেছি যে, আমি কোথা থেকে এসেছি। সেখানে আমার সাথে কি হয়েছে? আর কে ছিলো? শুধু এতটুকু বলিনি যে, আমার বাড়ি কোথায়। আমি এটা সেটা সব বলব। কিন্তু শুধু এটা বলব না যে, আমি কোন এলাকা থেকে এসেছি। সে তো আমার নিকট থেকে সবই শুনেছে, তখন মনে মনে সে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পাচ্ছে যে, আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি না বললেও, সে পূর্বাপর বিবেচনা করে বলে দেয় যে, আমার বিশ্বাস আপনি অমুক এলাকা থেকে এসেছেন। এখানে আমি এই উসূলের আমল করেছি যে, আমি সব বলতে পারব, শুধু একটি বিষয় ব্যতিত। কিন্তু মূল উসূল বা মূলনীতির উপর যদি আমল করি, তাহলে আশা করি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসল মূলনীতি হলো: আমি আমার সাথীকে শুধু ততটুকুই বলব, যতটুকু জানা তার জরুরত বা প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছেন? নিজ তথ্যভান্ডার নিজের কাছেই রেখে দিব। এই উসূলটির উপর আমল করব। কিন্তু এ মূলনীতির উপর আমল করতে গিয়ে আমাদের সামনে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। তা হলো- (মাশা-আল্লাহ) দেখা যায় ১৮ বা ২০/২৫ জন সাথী এক স্থানে বসে আছে। কিন্তু কেউ কোন কথা না বলে মুখ বন্ধ করে রাখে। বসে বসে একজন আরেকজনকে শুধু দেখে! এমনটি হওয়া উচিত নয়। বরং কথা বলার তো কত বিষয়ই আছে? সে সব বিষয় নিয়ে কথা বলুন। জিহাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে খুশি করাও অনেক বড় ইবাদত। এমন যেন না হয় যে, আমি খামুশ/চুপ হয়ে বসে থাকি। অনেক

ঘটনাই তো আছে? আমরা সেগুলো বলব। তাই আপনারা এই মূলনীতিটি খুব খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই মূলনীতির উপর চলার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জিহাদকে আমাদের জন্য সহজ করে দেন। (আমীন)

এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয়: যে সব ভাইকে আমরা আমাদের পরিবারভুক্ত মনে করি, তাদের সামনে একটি দরখাস্ত। যদিও কাজটা অনেক মুশকিল, মূলত: সব কাজই মুশকিল। আল্লাহ তা'আলা মুশকিলগুলোকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমরা যেন এ উসূলগুলো সামনে রেখে আমল করতে পারি এবং অন্যদেরও যেন এই মূলনীতি অনুযায়ী আমল করানো যায়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই মূলনীতিগুলো আমরা আমাদের ঘরোয়া লোকদেরকেও বলবো এবং শেখাবো। আমরা সকল মুজাহিদ একই পরিবারভুক্ত। আমাদের ভাইদের অসচেতনতার কারণে আমাদের বোনদেরও কষ্ট হতে পারে। এখানে যেহেতু আমরা সবাই এক দেহের মত এবং আমাদের এ দেহ এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। তাই আমাদের কোন সদস্য কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে? কোথায় আছে? এভাবে তারা আমাদের খবর নিয়ে নিবে। যখন এ মূলনীতিগুলো আমাদের বোনদের সামনে আসবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুব মজবুতভাবে আশা করা যায় যে, আমাদের বোনগণ নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বেশী সচেতন হবেন। এটা একটা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় যে, জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে বোনেরা, নিজের ভাইদেরকে এবং স্বামীদেরকে বেশী নসীহত করেন, যেন তাদের কোন ক্ষতি না হয়। তাই বোনদের প্রতি দরখাস্ত হলো: যে ক্ষতি হবে, তা জিহাদেরই ক্ষতি। যখন এটা স্পষ্ট হলো যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে: তথ্য যুদ্ধ। তারাও তথ্য নেওয়ার জন্য ঘুরে, আমাদের ভাইয়েরাও তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করে। যদি আল্লাহ না করুন! এ তথ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের হাতে চলে যায়। তাহলে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে সহযোগিতা করলাম।

আরও একটি কথা বলি। একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলেন, "যখন মানুষ একটা অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে চায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" আপনি নিজে নিজের উপর আবশ্যক করে নিন যে, আমি চল্লিশ দিন এ আমলটি

করব। ভাই-বোন আমরা সবাই চল্লিশ দিন এ আমল করে দেখব। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বোন বোনকে বলবে না, ভাই ভাইকে বলবে না। আমার কাছে কোন তথ্য থাকলে, তা আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাউকে বলবো না। যদি আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং নিজেই নিজের হিসেব গ্রহণ করি। প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা এ হিসাব করি যে, আমি আজ নিরাপত্তা বিষয়ে কি কি ভুল করেছি? আমরা যদি ৪০ দিন এমনটি করি। তাহলে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তা অবলম্বন করা, আমার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। তাছাড়া হাদীসে এ কথাও আছে- من صمت نجا "যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়।" তাও হয়ে যাবে। আমরা আমাদেরকে এমন সব কথা থেকে বিরত রাখব, যার কারণে নিরাপত্তা নষ্ট হয়। তাহলে এই নিরাপত্তা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করবে না। বরং ভালবাসা এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি আমরা একে অপরের সংশোধনের মাধ্যম হব এবং এই জিহাদের সহযোগিতার মাধ্যম হব। আর আমার ভিতরে এতটুকু অনুভূতি থাকতে হবে যে, আমার অসতর্কতার কারণে জিহাদের এত বড় ক্ষতি হতে পারে। তাহলে সতর্কতা বেড়ে যাবে। একজন সম্মানিত লোক বলেন, যখন মানুষ নিজের উপর আবশ্যক করে নিবে যে, আমি নিরাপত্তা অবলম্বন করব। তখন তার এই নিরাপত্তা অবলম্বনের মধ্যস্ততায় অনেক কিছু শেখা হবে। জিহাদে মুজাহিদীনের যে একতা, এটা ইনশা আল্লাহ নিরাপত্তা অবলম্বনের মাধ্যমে হবে। পুনরায় একটি কথা বলব- কোন জায়গায় দেখা গেলো যে, কয়েকজন ভাই শহীদ হয়েছেন। তারপর আমাদের উপর অনেক পরিমাণ বোমা বর্ষণ হয়েছে। তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, কারণ একটাই। তা হলো: হয়তো দূর থেকে কোন মেহমান সাথীকে ওখানে আনা হয়েছে। যিনি নিজেও শহীদ হয়ে গেছেন। আর তার কাছে মোবাইল ছিল।

ভাইয়েরা আমার! যিনি মেহমান তার জন্য তো উসূল বাতিল হয়নি। মেহমানের জন্য যেহেতু উসূল বাতিল হয়নি। তাই মেহমানকে নিজেদের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে আনা ঠিক হয়নি।

আলহামদু লিল্লাহ্! আফগানিস্তানে প্রতিটি ঘর আপনাদের মেহমানখানা। কোন ঘরের দরজাই আপনাদের জন্য বন্ধ নেই। যেখানেই কয়েকজন মেহমান মিলে যায়, তাদের ইজ্জত ও সম্মান করে বলা হয়- আরে! ওনাদেরকে ওখানে বসাও। ভালো করে মেহমানদারী করাও। অন্যান্য সাথীদের সংবাদ দিয়ে দাও যে, অমুক সাথী এসেছেন। যখন মেহমান আসে ও তার হাতে মোবাইল থাকে এবং তিনি প্রথম থেকেই নজরদারীর ভিতরে থাকেন। তখন যেহেতু তিনি প্রথম থেকেই নজরদারীতে আছেন, তাই তারা সেখানে চলে আসে। এজন্যই যখন আমরা আমাদের মুজাহিদ মেহমানদেরকে মুহাব্বত এবং আন্তরিকতার সাথে বলব যে, আমার মনে হয় আপনাকে ওদিকে নিয়ে গেলে এবং ও দিকেই আপনার সাথে সবাই একত্রিত হলে ভালো হবে।

আর খোদ যারা আমাদের পরিবারভুক্ত ভাই! এটা তো খুবই আফসোসের বিষয় যে, আমরা এমন পরিবেশেও একজন অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি যে, সে আমাকে তার ঘর দেখায়নি কেন? এই মূলনীতি সবাই নিজের জন্য আবশ্যক করে নিতে হবে যে, নিজের ঘর কাউকে দেখানো যাবে না। এটাকে যদি কেহ ভয় করে অথবা এতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে যিম্মাদারের উচিত, তার এ অসন্তুষ্টি দূর করা। কিন্তু খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, একে অন্যকে নিজের ঘর দেখানো যাবে না। এতে অবশ্যই আমাদের বোনদের কষ্ট হয়, সাথীদের কষ্ট হয়। আমাদের ভাইদেরও কষ্ট হয়। সুতরাং যিম্মাদার ভাইদের জন্য উচিত, এমন ভাইদের জন্য এমন কোন জায়গা ঠিক রাখা, যেখানে তাদের আরাম হবে। সেখানে যদি কোন ফ্যামিলি থাকে এবং ঐ ফ্যামিলি তার খেদমতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে ভালো। কিন্তু মেহমান সাথী ভাই অবশ্যই-অবশ্যই এমন ইচ্ছা দেখাতে পারবে না যে, আমাকে ফ্যামিলি থাকে, এমন ঘরে রাখা হোক। যা কিছু বলার ইচ্ছে ছিলো তা বলা হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। যদি আমরা এ কথাগুলোর উপর আমল করি, তাহলে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে নিরাপত্তা অবলম্বন করা সহজ হবে, (ইনশা আল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা এ কথাগুলোর উপর আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দিন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين، سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لااله إلا الله واستغفرك وأتوب إليه.

****